সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাপ থেকে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব (২০২৬–২০৪০) নিশ্চিতে প্রকৃতি-স্মার্ট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতে চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের ৩২.৮ বিলিয়ন ডলারের রোডম্যাপ উপস্থাপন

৩০ মার্চ, ২০২৬, ঢাকা: বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে "শূন্য কৃষি জমি" ব্যবহারভিত্তিক প্রাক্কলনের মাধ্যমে ৩২.৮২ বিলিয়ন ডলারের বিকেন্দ্রীকৃত নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিনিয়োগে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব অর্জন করে বিশ্ববাজারের মূল্যের অস্থিরতা থেকে অর্থনীতির সুরক্ষা প্রদানের রোডম্যাপ প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু গতানুগতিক বৈদেশিক অনুদানের অবদান আশঙ্কাজনক হারে কমছে, তাই অনুদানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ, মিশ্র অর্থায়ন (blended finance) এবং বাজার-ভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে কমিউনিটিনির্ভর জ্বালানি নিশ্চিতে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ঢাকার সিরডাপ (CIRDAP) মিলনায়তনে ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে 'চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ' থিঙ্ক-অ্যান্ড-ডু ট্যাঙ্ক কর্তৃক আয়োজিত "নির্ভরশীলতা থেকে সার্বভৌমত্ব: ন্যায়সংগত জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিনিয়োগ রোডম্যাপ" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে আমদানিনির্ভর জ্বালানি খাতের পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে ২০২৬ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪০% বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে করপোরেট ও বিকেন্দ্রীকৃত নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে বিনিয়োগ কাঠামো উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় ২০৪০ সালের মধ্যে জ্বালানির চাহিদা তিনগুণ বেড়ে ৩১৬,৫০০ গিগাওয়াট ঘণ্টা (GWh) হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা সময়মতো বাড়াতে ব্যর্থ হলে তা সমৃদ্ধ অর্থনীতি গঠনের সুযোগ নস্যাৎ হতে পারে। বাংলাদেশে প্রচলিত "কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল" জ্বালানি মডেলটি তার আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এই গবেষণার প্রধান গবেষক ছিলেন চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এম. জাকির হোসেন খান এবং সহ-গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এম. মোফাজ্জল হোসেন, সামিরা বাশার রোজা ও কাজী কারিনা আরিফ।

গবেষণার মূল তথ্যসমূহ: এক নজরে

- মোট বিনিয়োগের প্রয়োজন: বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর ন্যায্য রূপান্তরের জন্য ২০৪০ সাল পর্যন্ত ৩২.৮২ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।
- পর্যায়সমূহ: এই বিনিয়োগ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, ২০৩০ সালের মধ্যে ৮.৭২ বিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তীতে ২০৩১-২০৪০ সময়কালে ২৪.১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

- বিনিয়োগের অর্থনৈতিক সুফল: নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে ১৭ ডলারের অর্থনৈতিক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আগামী ১৫ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫৭ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রিক সুফল যুক্ত হবে, যা বছরে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

- মোট সক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা: ২০৪০ সালের মধ্যে ২১,৫১৪ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনের লক্ষ্য। এর মধ্যে শিল্পকারখানার ছাদ থেকে ১২,০৪৮ মেগাওয়াট, কৃষকদের জন্য সোলার সেচ থেকে ৩,৪৪২ মেগাওয়াট, এবং নদী ও জলাশয়ে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ থেকে ১,৭২১ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত।

- ভূমির প্রভাব: এই পরিকল্পনায় কোনো কৃষিজমির প্রয়োজন নেই। কারখানার বিদ্যমান ছাদ এবং জলাধার ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোডম্যাপ ৬০,০০০ একর উর্বর কৃষিজমি রক্ষা করবে, যা নিশ্চিত করবে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেন খাদ্য নিরাপত্তার সাথে প্রতিযোগিতায় না নামে।

- গ্রিড স্থিতিশীলতা (স্টোরেজ): ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS)-এর জন্য নির্দিষ্টভাবে ৭.৮৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এই "স্থিতিশীলতা প্রিমিয়াম" দিনের বেলা উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ জমা রাখার জন্য অপরিহার্য, যাতে তা সন্ধ্যার পিক আওয়ারের সময় ব্যবহার করা যায়।

- অপচয় হ্রাস: নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় হওয়া বার্ষিক ২০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করতে সাহায্য করবে। এটি অতিরিক্ত দামের জীবাশ্ম জ্বালানি চুক্তিগুলো টিকিয়ে রাখতে বর্তমানে প্রয়োজনীয় বার্ষিক ৫ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকির সমস্যাও সমাধান করবে।

বাংলাদেশে অন্যতম বড় একটি উদ্বেগ হলো যে, বড় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান জমি দখল করে নিতে পারে। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে, আমাদের খাদ্য উৎপাদনকারী জমির এক ইঞ্চি জায়গাও নষ্ট না করে আমরা আমাদের জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি। একটি "বিকেন্দ্রীকৃত" মডেল অনুসরণের মাধ্যমে, যার অর্থ হলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ঠিক সেখানেই স্থাপন করা যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, আমরা প্রায় ৬০,০০০ একর প্রধান কৃষিজমি বাঁচাতে পারি। প্রতিটি গ্রামে কমিউনিটি গ্রিডের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎনির্ভর জ্বালানি সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

রোডম্যাপে তিনটি খাতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথমত, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রুফটপ সোলার (১২,০৪৮ মেগাওয়াট), যার মাধ্যমে ফসলের মাঠের বদলে আমরা পোশাক কারখানা এবং শিল্প ভবনগুলোর ছাদের ৫০% "অব্যবহৃত" জায়গা ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এবং শিল্পাঞ্চলগুলোকে স্বনির্ভর জ্বালানির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ অর্ধেকে নামিয়ে এনে উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারবে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিটিকেন্দ্রিক গ্রিডের মাধ্যমে সোলারভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা (৩,৪৪২ মেগাওয়াট) যা ১.৩৪ মিলিয়ন ব্যয়বহুল

ডিজেল চালিত পানির পাম্পকে “নবায়নযোগ্য জ্বালানি হাবে" রূপান্তরিত করবে। যা কৃষকদের সস্তায় পানি দেবে এবং যখন সেচ কাজে লাগবে না তখন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ (১,৭২১ মেগাওয়াট): কাপ্তাই হ্রদ, জলাশয় এবং খাল, পুকুরগুলোতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে কোনো জমি ব্যবহার করবে না; পানির প্রাকৃতিক শীতলতা প্যানেলগুলোকে গরম ভূমিতে থাকা প্যানেলের তুলনায় ৫-১০% বেশি কার্যকরভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করে।

এ গবেষণার প্রধান গবেষক এবং চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভ-এর নির্বাহী প্রধান এম. জাকির হোসেন খান বলেন, "বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তর কোনো অর্থায়নের সমস্যা নয়; এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা, যা জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক দুর্নীতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। চলমান সংকটে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ভর করে আস্থা, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনী অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে যা মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশে সৌরশক্তি কেবল একটি জলবায়ু প্রশমন সরঞ্জাম নয়, বরং জলবায়ু সহনশীলতার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রাণ ও প্রকৃতির ক্ষয়-ক্ষতি (loss-and-damage) হ্রাসের প্রধান ভিত্তি। তাই ঝুঁকিপূর্ণ উপকূল, পাহাড়ি, হাওর ও বাওর অঞ্চলগুলোর মানুষের জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিতে অন্তত ৫০% অনুদান-ভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা কোনো দান নয়, বরং বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায়সংগত দায়িত্ব। ৩২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে ঋণ-ভিত্তিক অর্থায়ন থেকে সরে অনুদান, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বাজার আস্থার পাশাপাশি জনহিতকর অর্থায়ন ভিত্তিক মডেল দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জ্বালানি সার্বভৌমত্ব ঋণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। বিদ্যমান উচ্চ ব্যয়কে পূর্ণ উৎপাদনশীলতায় রূপান্তর করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রাকৃতিক অধিকারকেন্দ্রিক শাসন কাঠামো গ্রহণ করতে হবে।"

কেন এই গবেষণা এখন গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশের জ্বালানি খাত একটি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, যা প্রবৃদ্ধির চালক থেকে জাতীয় আর্থিক অস্থিতিশীলতার প্রাথমিক উৎসে পরিণত হয়েছে। এই গবেষণাটি এমন এক "অনিশ্চয়তার" মুহূর্তে উপস্থাপন করা হচ্ছে যখন ব্যয়বহুল, আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভর করার ঐতিহ্যগত মডেলটি জাতীয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রোডম্যাপের জরুরি প্রয়োজনীয়তা চারটি সংকটময় চাপের কারণে দেখা দিয়েছে:

- তীব্র আমদানি ঝুঁকি: বাংলাদেশ বর্তমানে তার জ্বালানি চাহিদার ৫৬%-এর বেশি আমদানির ওপর নির্ভর করে। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই দেশটি জ্বালানি আমদানি এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধে ২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এখন দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) সরবরাহের শৃঙ্খলকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

- ক্রমবর্ধমান ঋণ চাপ: ২০০৯ সাল থেকে দেশের বৈদেশিক ঋণ ৩৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২৫ সালে প্রায় ১১২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যেহেতু সুদ পরিশোধে জাতীয় রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হয়, তাই দেশটি একটি স্থায়ী "জ্বালানি ঋণের ফাঁদে" পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

- শিল্প খাতে বিপর্যয়: সাম্প্রতিক গ্যাস সংকটের কারণে ২৩% বিদ্যুৎ কেন্দ্র অকেজো হয়ে পড়েছিল, যার ফলে কারখানাগুলো তাদের সক্ষমতার মাত্র ৩০-৪০% চালাতে বাধ্য হয়েছিল এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিঃশেষ হয়েছিল। ২০২৫ সালে এলএনজি আমদানিতেই ৩.৮৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হওয়ায় অর্থনীতি প্রতিনিয়ত বৈশ্বিক মূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধির ঝুঁকিতে থাকে।

- অস্তিত্ব রক্ষার অগ্রাধিকার হিসেবে জলবায়ু জরুরি অবস্থা: বিশ্বের সপ্তম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর কোনো "ঐচ্ছিক" পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, এটি টিকে থাকার কৌশল। এই রূপান্তরে ব্যর্থ হলে জলবায়ুর প্রভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির ১.৩% স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

এই রোডম্যাপ প্রমাণ করে যে বিকেন্দ্রীকৃত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি থেকে রক্ষা করা, শিল্প উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)-এর মহাপরিচালক ড. এ. কে. এনামুল হক বলেন: "বাংলাদেশের জ্বালানি রূপান্তরকে আশাবাদ থেকে বাস্তববাদে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ, খণ্ডিত শাসন ব্যবস্থা এবং নিম্ন দক্ষতার কারণে স্থাপিত সক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদনে রূপান্তরিত হচ্ছে না। প্রকৃত সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য আমাদের একটি কেন্দ্রীয় মডেল থেকে গ্রাম-পর্যায়ের বিকেন্দ্রীকৃত সৌরবিদ্যুতের দিকে যেতে হবে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজের ওভারল্যাপ দূর করতে হবে এবং কেবল প্রযুক্তি গ্রহণের চেয়ে কঠোর জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"

ইউএনডিপি (UNDP)-এর কান্ট্রি ইকোনমিক অ্যাডভাইজার ওয়েইস পারায়ে বলেন, "বাংলাদেশে জ্বালানি রূপান্তর কেবল বিদ্যুতের বিষয় নয়; এটি একটি সবুজ শিল্প বিপ্লব। সফল হতে হলে আমাদের অবশ্যই অর্থায়নযোগ্য পাইপলাইন এবং আর্থিক উদ্ভাবন তৈরি করতে হবে যা মিলিয়নকে বিলিয়নে উন্নীত করতে পারে এবং এমন একটি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে যা জ্বালানি-সার্বভৌম এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিস্থাপক। এ রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।"

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (BERC) পরিচালক (যুগ্ম সচিব) দিদারুল আলম মন্তব্য করেন, "আমদানিকৃত গ্যাস ও কয়লার ওপর আমাদের নির্ভরতা আমাদের বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিচ্ছে। প্রকৃত

জ্বালানি সার্বভৌমত্বের জন্য কেবল নীতির চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন; এটি দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং মাল্টি-বায়ার মার্কেটের দিকে একটি পূর্ণ পরিবর্তনের দাবি রাখে। এই রূপান্তর ছাড়া বাংলাদেশ টেকসই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরনির্ভরশীলতার চক্রে আটকে থাকবে।"

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (BPDB) পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম মোল্লাহ বলেন: "জ্বালানি সার্বভৌমত্বের পথে বাংলাদেশের যাত্রা আর কোনো সম্ভাবনা নয়, এটি এখন একটি জরুরি অনিবার্যতা। সৌর ও বায়ুবিদ্যুতে যে গতি সঞ্চার হয়েছে, তা বজায় রাখতে আমাদের ফোকাস এখন কাগুজে লক্ষ্যমাত্রা থেকে বাস্তবায়নের দিকে সরাতে হবে। আমরা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক আবু আলম বলেন: "০.৭৩% খেলাপি হারের মাধ্যমে আমাদের সবুজ অর্থায়নের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩,৫০০ মেগাওয়াটের বাস্তব সক্ষমতায় পৌঁছাতে আমাদের এখন কাঠামোগত এবং অর্থায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে হবে যা আমাদের পরিধিকে সীমিত করে। সোলার সেচ একটি প্রমাণিত সুযোগ যা এখন বড় আকারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।"

দেশীয় পুঁজি সংগ্রহের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইডকল (IDCOL)-এর নির্বাহী পরিচালক ও সিইও আলমগীর মোর্শেদ বলেন: "নবায়নযোগ্য জ্বালানি এখন একটি বাণিজ্যিক নিশ্চয়তা, তবুও বিশাল এবং অব্যবহৃত সুযোগের তুলনায় সামগ্রিক বিনিয়োগ এখনও অনেক কম। আমাদের সামনের পথে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং মুদ্রার ঝুঁকি কমাতে দেশীয় পুঁজি বাজারকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং বাজার-ভিত্তিক অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা নীতিগত লক্ষ্যমাত্রা থেকে দেশব্যাপী একটি সম্প্রসারিত জ্বালানি বাস্তবতায় পৌঁছাতে পারি।"

গোলটেবিল আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথি ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম, লঙ্গি সোলার (LONGi Solar)-এর সিনিয়র সেলস ম্যানেজার মীর মো. আহসান হুদা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি-এর উপসচিব শাহ আব্দুল সাদী। এছাড়াও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অ্যাকশন এইড-এর ম্যানেজার মো. আবুল কালাম আজাদ, ফেয়ারব (FERB)-এর চেয়ারম্যান এম. আজিজুর রহমান, বিইজেএফ-এর সভাপতি মোস্তফা কামাল মজুমদার, আইইইএফএ (IEEFA)-এর লিড অ্যানালিস্ট শফিকুল আলম এবং ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি-এর তাশমিম মুনতাসির চৌধুরী। বিশেষজ্ঞ মতামত তুলে ধরেন বিএসআরইএ (BSREA)-এর জাহিদুল আলম, বিপেড (BIPED)-এর সাদাব মুবতাসিম, কার্বোবন-এর নাভিদ হায়দার, ডেসকো-এর ইঞ্জিনিয়ার মো. নাসির উদ্দিন মিয়া, পিনেট (PINET)-এর সমন্বয়কারী নাজমুল হাসান, কৌশলগত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ফারাহ আনজুম এবং ডায়রা-এর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। যুব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাতিমা তুজ জুহরা সাদিয়া, ইয়ঙ্গো (YOUNGO)-এর মাহদী আল ওয়াকিল।

সংস্কারের রূপরেখা: ব্যবধান ঘুচানো

৩২.৮২ বিলিয়ন ডলারের এই বিনিয়োগ উন্মুক্ত করতে এবং জ্বালানি স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য রোডম্যাপটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সংস্কারের রূপরেখা প্রদান করে:

- বাজার-সহায়ক মডেল: রাষ্ট্রের ভূমিকাকে একক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী থেকে পরিবর্তন করে একজন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে, যা বিভিন্ন জ্বালানি উৎপাদক এবং শিল্প গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন করবে।
- সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারিং হাউস: কারিগরি অনুমোদন সহজ করতে একটি ইউনিফাইড রেগুলেটরি ইন্টারফেস প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রক্রিয়াটিকে মানসম্মত করবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য লেনদেনের খরচ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেবে।
- উদ্ভাবনী সামাজিক ও প্রবাসী অর্থায়ন: প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের সঞ্চয় কাজে লাগাতে "প্রবাসী" গ্রিন ডায়াসপোরা বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে বিকল্প পুঁজি সংগ্রহ করা। এছাড়া প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায়কে সৌর সেচ ব্যবস্থায় ঋণমুক্ত ইক্যুইটি প্রদানের জন্য "উৎপাদনশীল জাকাত" তহবিল ব্যবহার করা।
- ফসিল ফুয়েল সানসেট ফি: শিল্পকারখানার গ্যাস বিলের ওপর ধাপে ধাপে একটি লেভি বা শুল্ক আরোপ করা। তবে যে কারখানাগুলো ছাদের সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করবে তাদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকবে, যাতে সংগৃহীত রাজস্ব গ্রিন গ্রিড আপগ্রেড করার কাজে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
- এলএনজি পুঁজি পুনঃবিনিয়োগ: ভবিষ্যতে এলএনজি অবকাঠামো সম্প্রসারণ সীমিত করা এবং সেই তহবিলগুলোকে দেশীয় নবায়নযোগ্য সম্পদে বিনিয়োগ করা। এটি দেশকে পরিবর্তনশীল জ্বালানি নির্ভরতা থেকে সরিয়ে স্থায়ী ও অবকাঠামো-চালিত সম্পদের দিকে নিয়ে যাবে।

এই রোডম্যাপ কেবল একটি কারিগরি প্রস্তাব নয়; এটি দেশের আর্থিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজন। একটি স্থিতিস্থাপক ও স্বনির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার ভবিষ্যৎকে স্থানীয় অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধিতে নোঙর করতে পারে।

মিডিয়া যোগাযোগ:
মো. সোহান আহমেদ
কমিউনিকেশন এক্সিকিউটিভ

ইমেইল: sohan@changei.earth

মোবাইল: +৮৮ ০১৬৭১১৪৫৮০২